দলিত রাজনীতি ও আন্দোলন
(Dalits' Politics and Movement)

ড. অনিরুদ্ধ চৌধুরী

প্রায় তিন দশক ধরে সমাজতাত্ত্বিকদের আলোচনায় দলিত আন্দোলন অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। আইনের চোখে সমতা কিন্তু আর্থ সামাজিক ক্ষেত্রে অসমতা ভারত রাষ্ট্রের এমনই একটি কার্যত বৈপরীত্যমূলক প্রেক্ষাপটে দলিত আন্দোলন কতটা কার্যকরী ও ফলপ্রসূ হতে পারে-সে বিষয়ে জানতে অনেকেই আগ্রহী। দলিত রাজনীতি ও দলিত আন্দোলনের উপর সাম্প্রতিক কালে অনেক লেখা প্রকাশিত হয়েছে।

বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানী গোপাল গুরু'র মতে, উদার ভাবধারায় বিশ্বাসী সমাজতাত্ত্বিকরা মনে করেন দলিত আন্দোলন হলো প্রাচীন ভারতীয় হিন্দু সমাজের উচ্চবর্ণের কুসংস্কার ও দলিত শোষণের মানসিকতার বিরুদ্ধে নিষ্পেষিত শ্রেণির প্রতিবাদ আন্দোলন। যদিও তাঁদের মতে, দলিত আন্দোলন বিদ্যমান সমাজ কাঠামোর আর্থ-সামাজিক, পৌর এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে খুব বেশি সুবিধা আদায় করতে পারেনি। (গোপাল গুরু, ২০০৯)

'দলিত' পরিচিতি-সত্তা (Dalit Identity)

'দলিত' কারা? সুনির্দিষ্টভাবে 'দলিত' শব্দের সংজ্ঞা নির্ণয় করা খুব কঠিন। 'দলিত' বলতে কাদের বোঝানো যাবে সে বিষয়ে সমাজবিজ্ঞানীরা পুরোপুরি একমত নন। ব্যুৎপত্তিগত-ভাবে 'দলিত' শব্দটি উদ্ভূত হয়েছে 'দলন' থেকে। 'দলন' অর্থ 'বলপূর্বক কাউকে দমিয়ে রাখা' বা অবদমন করা। 'দলিত' শব্দটি ভারতবর্ষের রাজনৈতিক- সামাজিক আঙিনায় খুব বেশি পুরোনো না হলেও এদেশে 'দলন' শব্দটির প্রচলন বহুদিন আগে থেকেই। অধ্যাপক হীরেন মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, 'দলন' বস্তুটি আমাদের দেশে ও সমাজে আবহমান কাল থেকে প্রায় একটি 'ফাইন আর্টস'-এ পরিণত হয়েছে, যার তুলনা জগতে শুধু দুর্লভ নয়, একেবারে অপ্রাপ্য। মুনি ঋষিদের দোহাই দিয়ে আর নিত্যকর্ম পদ্ধতিকে ধর্মের শিকলে বেঁধে রেখে, সঙ্গে সঙ্গে শুধু বর্ণাশ্রম, জাতিভেদ ('অস্পৃশ্যতা' যার সঙ্গে

অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধে লিপ্ত) আর জন্মান্তরবাদের মতো ধারণার জোরে ইতিহাসে সর্বকালে সর্বদেশের সবচেয়ে মজবুত 'শ্রেণিকর্তৃত্বের' ইমারত এদেশের মনুবাদীরা ঐতিহাসিক দক্ষতায় প্রতিষ্ঠা করে গিয়েছেন' (হীরেন মুখোপাধ্যায়, ২০০৩)। কারো মতে, প্রাচীনকালে 'দলিত' বলতে 'ভগ্ন মানুষ' বোঝানো হোতো (broken to pieces)।

হিন্দি, মারাঠি, গুজরাটি ইত্যাদি ভাষায় দরিদ্র ও শোষিত মানুষদের বোঝাতে 'দলিত' শব্দটি অনেক কাল থেকেই ব্যবহৃত হয়। তবে সাম্প্রতিককালের 'পরিচিতি-সঙ্কট' রাজনীতি (identity politics), সংস্কৃতি ও সাহিত্য আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে 'দলিত' শব্দটি নতুন রূপ পরিগ্রহ করেছে। ১৯৩০ সালে পুনে থেকে প্রকাশিত হতো বঞ্চিত শ্রেণির মুখপত্র হিসেবে একটি পত্রিকা। তার নাম ছিল 'দলিত-বন্ধু'। সম্ভবত এই সময়কাল থেকেই মারাঠা এবং হিন্দি অনুবাদে বঞ্চিত শ্রেণি (depressed class) বোঝাতে 'দলিত' শব্দটির বহুল ব্যবহার শুরু হয়।

'দলিত' শব্দটি সংকীর্ণ ও ব্যাপক-দুই অর্থেই ব্যবহার করা হয়। সংকীর্ণ অর্থে 'দলিত' শব্দের সাহায্যে জাতি বর্ণপ্রথাযুক্ত স্তরবিন্যস্ত হিন্দু সমাজের অস্পৃশ্য অংশকে বোঝানো হয়। হিন্দু বর্ণব্যবস্থার নিরিখে 'দলিত' হলো সেই মানুষেরা যাদের অবস্থান চতুর্বর্ণ-এর বাইরে। সেই অর্থেই এই ধরনের মানুষেরা 'অবর্ণ' বা 'অতিশূদ্র' হিসেবে সনাতন ভারতীয় সমাজে পরিচিত ছিল। বিশিষ্ট সমাজতাত্ত্বিক ঘনশ্যাম শাহ-এর মতে, সনাতনী হিন্দু সমাজ শৃঙ্খলায় এদের একেবারে নীচের সারিতে স্থান হতো, এদের অতিশূদ্র অথবা অবর্ণ (Ati-Shudras or Avarna) হিসেবে বিবেচনা করা হতো এবং এই কারণে এই সব মানুষদের অস্পৃশ্য (untouchables) করে রাখা হতো। (ঘনশ্যাম শাহ, ২০০১)

বর্তমানে 'দলিত' শব্দটি অনেক ক্ষেত্রেই ব্যাপকতর অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এক জাতিগত নিপীড়নের পাশাপাশি অর্থনৈতিক দিক থেকে নিপীড়িতদেরও 'দলিত' ধারণার অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে। এছাড়াও সনাতন ভারতীয় সমাজের প্রায় সব অংশের মহিলারাই নানা অধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়ায় অনেক সমাজবিজ্ঞানী এদেরও ব্যাপক অর্থে 'দলিত' ধারণার অন্তর্ভুক্ত করতে চান। অর্থাৎ সমাজে সব ধরনের উৎপীড়িত ও নির্যাতিত মানুষদেরই 'দলিত' ধারণার অন্তর্ভুক্ত করার প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

প্রশাসনিক পরিভাষায় 'দলিত' বলতে সাধারণত তফসিলী জাতিভুক্তদেরই (Scheduled Caste) বোঝানো হয়। অনেকে আবার তফসিলী উপজাতি (Scheduled Tribe) এবং অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণি সমূহকেও (Other Backward Classes) 'দলিত' শব্দের অন্তর্ভুক্ত করেন। তবে এ প্রসঙ্গে এ বিষয়টাও অনেকে উল্লেখ করেন যে সব 'পূর্বতন অস্পৃশ্য' (ex-untouchables) জাতিগুলিই যে তফসিল বা সিডিউলে অন্তর্ভুক্ত

রয়েছে এমন নয়। আবার অন্যদিকে তফসিলভুক্ত সব জাতিগুলিই যে ইতিহাসগতভাবে অস্পৃশ্যতার শিকার হয়েছে একথাও সবাই মনে করেন না।

তাই সাধারণভাবে একথা বলা যায় যে 'দলিত' শব্দটির ব্যাপক অর্থে ব্যবহার নিয়ে অস্পষ্টতা আছে. তবে, সনাতন ভারতীয় সমাজে অতিশূদ্র বা অবর্ণ মানুষ যাঁদের সমাজে অস্পৃশ্য করে রাখা হতো তাদের বোঝাতে 'দলিত' শব্দের ব্যবহার নিয়ে কোনো মতভেদ নেই।

তবে এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা দরকার যে সম্প্রতি ভারত সরকারের সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রক কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারী দপ্তরগুলিকে 'দলিত' শব্দের পরিবর্তে 'তফসিলী জাতিভুক্ত ব্যক্তি' (person belonging to Scheduled Caste) কথাটি ব্যবহার করার পরামর্শ দিয়েছে। বোম্বে হাইকোর্টের নাগপুর বেঞ্চে সম্প্রতি একটি জনস্বার্থ মামলায় রায় দানের সময় মাননীয় বিচারপতি কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রককে বিবেচনা করে দেখতে বলেছেন যে গণমাধ্যমগুলিকেও একই পরামর্শ দেওয়া যায় কিনা (টাইমস অব ইন্ডিয়া, জুন ৮, ২০১৮)।

ভারতবর্ষে দলিত আন্দোলন (Dalit Movements in India)

ভারতবর্ষে সংঘটিত উল্লেখযোগ্য দলিত আন্দোলনগুলি যতটা সম্ভব কালানুক্রমিক-ভাবে নীচে আলোচনা করা হলো—

নায়ার আন্দোলন (Nair Movement) : ১৮৬১ সালে কেরালায় সি. ভি. রামন পিল্লাই, কে. রামকৃষ্ণ পিল্লাই এবং এম পদ্মনাভ পিল্লাইয়ের নেতৃত্বে এই আন্দোলন শুরু হয়। ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের আধিপত্যের বিরুদ্ধে এই আন্দোলন সংঘটিত হয়েছিল। এই উদ্দেশ্যে ১৮৯১ সালে মালওয়ালি মেমোরিয়াল সোসাইটি গঠন করেন রামন পিল্লাই। পরবর্তীকালে একই উদ্দেশ্যে ১৯১৪ সালে নায়ার সার্ভিস সোসাইটি স্থাপন করেন পদ্মনাভ পিল্লাই। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের আগ্রাসনের বিপরীতে তথাকথিত 'নীচু' জাতভুক্ত মানুষদের রক্ষা করার লক্ষ্যে এই আন্দোলন তৎকালীন সময়ের প্রেক্ষিতে যথেষ্ট গুরুত্ব লাভ করেছিল।

সত্যশোধক আন্দোলন (Satyashodhak Movement) : ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র এবং তার সহায়ক হিন্দু পুঁথি ও ধর্মগ্রন্থগুলির নিদান থেকে নিম্নজাতভুক্ত মানুষদের রক্ষা করার উদ্দেশ্য নিয়ে জ্যোতিরাও ফুলে (১৮২৭-৯০)'র নেতৃত্বে মহারাষ্ট্রে এই আন্দোলন গড়ে ওঠে। এই লক্ষ্য নিয়েই তিনি ১৮৭৩ সালে প্রতিষ্ঠা করেন 'সত্যশোধক সমাজ'। মহারাষ্ট্রে অনগ্রসর 'মালি' জাতির নেতা ছিলেন জ্যোতিরাও ফুলে। তাঁর মতে, হিন্দুত্বের ইতিহাস শূদ্রদের ওপর ব্রাহ্মণদের অত্যাচারের ইতিহাস। ১৮৭৩ সালে 'গুলামগিরি' গ্রন্থের

মাধ্যমে ফুলে এই ধরনের নির্যাতন ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে জোরদার ঘোষণা করেন। ভারতবর্ষে আর্য আধিপত্যের প্রচলিত ব্যাখ্যা তিনি স্বীকার করতেন না। তাঁর মতে, আর্যরা বিদেশী এবং ব্রাহ্মণরা তাদেরই উত্তর পুরুষ, মহারাষ্ট্রের স্থানীয় আদিবাসীদের ওপর তারা অন্যায়ভাবে আধিপত্য কায়েম করেছে।

আনেকের মতে, জ্যোতিরাও ফুলে ছিলেন ভারতের 'অস্পৃশ্য জাতিভুক্ত মানুষদের' প্রথম চিন্তাবিদ যাঁর নেতৃত্বে 'দলিত-চেতনা' বিকাশ লাভ করতে শুরু করে। তিনি বিশ্বাস করতেন, জাতি-কাঠামো অটুট রেখে তার মধ্যে শূদ্রদের অবস্থানগত পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে খুব কিছু লাভ হবে না। জ্যোতিরাও প্রশ্ন তুলেছিলেন জাতিভেদ প্রথার বৈষম্যমূলক সামাজিক সংগঠনটির বিরুদ্ধে। জ্যোতিরাও ফুলের নেতৃত্বে অস্পৃশ্য জাতভুক্ত মানুষদের সংগঠিত করে এই আন্দোলন তাঁর মৃত্যুর পর অনেকটাই স্তিমিত হয়ে পড়ে। সাহু মহারাজ ১৯১২ সালে কোলাপুরে 'সত্যশোধক মণ্ডল' স্থাপন করে জ্যোতিরাও ফুলের এই 'দলিত' আন্দোলনকে কিছুটা হলেও এগিয়ে নিয়ে যেতে চেষ্টা করেছিলেন।

জাস্টিস পার্টি আন্দোলন (Justice Party Movement) : ভারতবর্ষে দলিত আন্দোলনের উদ্ভব ও বিকাশের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল জাস্টিস পার্টি আন্দোলন। ব্রাহ্মণ-আধিপত্যের বিরুদ্ধে ১৯১৬ সালে মাদ্রাজে অব্রাহ্মণদের রাজনৈতিক দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিল জাস্টিস পার্টি। এই দলের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন মূলত তিন ব্যক্তি—টি. এম. নায়ার (T. M. Nair), থেগারোয়া চেট্টি (Theagaroya Chetty) এবং সি. এন. মুদালিয়ার (C. N. Mudaliar)। সাউথ ইন্ডিয়ান লিবারল ফেডারেশন (SILF) রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করার লক্ষ্য নিয়েই জাস্টিস পার্টি গঠন করে।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ এবং বিংশ শতাব্দীর শুরু—এই সময়কালে ব্রিটিশ অধিকৃত ভারতবর্ষের মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে ব্রাহ্মণ এবং অব্রাহ্মণদের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও বিবাদ শুরু হয়। জাতপাতের বিধিনিষেধ এবং সরকারী চাকরীতে ব্রাহ্মণদের একচ্ছত্র আধিপত্যের বিরুদ্ধে দলিত শ্রেণির মানুষ সংগঠিত হতে থাকে। তাঁরা এই বিষয়গুলিকে সামনে রেখে ধারাবাহিকভাবে অনেক সম্মেলন ও সভার আয়োজন করেন। এসবেরই ফলশ্রুতি হিসেবে তাঁদের প্রতিবাদ ও আন্দোলনকে আরও সংগঠিত এবং শক্তিশালী করার লক্ষ্য নিয়েই জাস্টিস পার্টি গঠন করা হয়। প্রথম থেকেই এই পার্টি দলিত আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং প্রতিবাদের মুখ হয়ে ওঠে। শুরুতেই এই দল ব্রিটিশ প্রশাসনের কাছে সরকারী চাকুরীতে তাদের প্রতিনিধিত্বের দাবীতে স্মারকপত্র জমা দেয়। মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে জাস্টিস পার্টির ভূমিকা ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে থাকে। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের রাজনৈতিক বিকল্প হিসেবে এই দল মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে ভূমিকা পালন করতে থাকে। মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির নির্বাচনে বেশ কয়েকবার জয়লাভ করলেও ১৯৩৭ সালের

নির্বাচনে জাতীয় কংগ্রেসের কাছে হেরে যায়। এই বিপর্যয় থেকে জাস্টিস পার্টি আর ঘুরে দাঁড়াতে সক্ষম হয় না।

একথা এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে মাদ্রাজের ব্রাহ্মণ্য বিরোধী আন্দোলনে 'দলিত'রা যতটা না সক্রিয় ছিল তার চেয়েও অনেক বেশি সক্রিয় ছিল শিক্ষিত ও সচ্ছল অব্রাহ্মণ জাতভুক্ত মানুষেরা। জাস্টিস পার্টি আন্দোলন ধীরে ধীরে 'অস্পৃশ্য' জাতভুক্ত মানুষদের এবং মুসলমানদের সমর্থন হারাতে থাকে। অভিযোগ উঠতে শুরু করে এই দল শুধুমাত্র মুদালিয়ার, পিল্লাই, নাইডু, বেরি, চেট্টি, কাপু, কাম্মা ইত্যাদি কতিপয় অব্রাহ্মণ জাতেরই স্বার্থরক্ষা করে চলেছে।

তবে একথা অনেকেই স্বীকার করেন যে জাস্টিস পার্টি আন্দোলন তাদের কিছু কিছু সাফল্যের জন্য স্মরণীয় হয়ে থাকবে। জাতভিত্তিক সংরক্ষণ এদেরই আন্দোলনের ফলশ্রুতি। অন্ধ্র এবং আন্নামালাই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও এদের আন্দোলনের বিশেষ ভূমিকা আছে। বর্তমানে তামিলনাড়ুতে ডি. এম. কে. (দ্রাবিড় মুনাত্রা কাজাঘাম) বা আন্না ডি. এম. কে. (আন্না দ্রাবিড় মুনাত্রা কাজাঘাম) জাস্টিস পার্টি আন্দোলনের মতাদর্শকে ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে।

আত্মসম্মান আন্দোলন (Self-respect Movement) : ই. ভি. রামাস্বামী যিনি পেরিয়ার (Periyar) নামে মানুষের কাছে অনেক বেশি পরিচিত, ১৯২১ সালে তামিলনাড়ুতে 'আত্মসম্মান আন্দোলনের' সূত্রপাত করেন। এই আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল এমন একটা সমাজ গঠন করা যেখানে অনগ্রসর জাতিগুলিরও সমান মানবাধিকার থাকবে। পেরিয়ার বিশ্বাস করতেন এই লক্ষ্য পূরণ করতে হলে জাতিভেদভিত্তিক এই সমাজে একেবারে 'নীচু' জাতির মানুষের মধ্যে আত্মসম্মানবোধ জাগিয়ে তোলা দরকার। আত্মসম্মান আন্দোলনের মাধ্যমে পেরিয়ার এই সব মানুষ এবং গোষ্ঠীগুলির হীনমন্যতাবোধ দূর করতে চেয়েছিলেন। সচেতনতা প্রসার করে নিয়তিবাদী এইসব মানুষদের বাস্তববাদী এবং যুক্তিবাদী মানুষে পরিণত করতে চেয়েছিলেন। তাঁর মতে, আত্মমর্যাদাহীন মানুষকে দিয়ে প্রকৃত অর্থে কোনো প্রতিবাদী আন্দোলন গড়ে তোলা খুব কঠিন। তাই ব্রাহ্মণ আধিপত্যের বিরুদ্ধে দলিত মানুষের প্রতিবাদ আন্দোলনকে শক্তিশালী করার স্বার্থেই পাশাপাশি এদের মধ্যে আত্মসম্মান বা আত্মমর্যাদা আন্দোলনকে ছড়িয়ে দিতে হবে। তাঁর এই আন্দোলন শুধু তামিলনাড়ু বা দক্ষিণ ভারতেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। ভারতের অন্যান্য রাজ্যে এমনকী ভারতের বাইরে মালেশিয়া এবং সিঙ্গাপুরেও ছড়িয়ে পড়েছিল। যেখানেই একটু বেশি সংখ্যায় নিম্নবর্গীয় তামিল মানুষদের বসবাস সেখানেই এই আন্দোলন চোখে পড়েছে। টি. জি. সারাঙ্গপানির নেতৃত্বে এবং তামিল রিফর্ম এসোসিয়েশানের উদ্যোগে বিদ্যালয় এবং পত্রপত্রিকার মাধ্যমে আত্মসম্মান আন্দোলনের

নীতিগুলি প্রচার করা হয়। পেরিয়ার প্রতিষ্ঠিত আত্মমর্যাদা বা আত্মসম্মান আন্দোলন দলিত ও অব্রাহ্মণ মানুষদের দৈনন্দিন জীবনে ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের প্রভাব দূর করার কর্মসূচি গ্রহণ করে। যেমন ব্রাহ্মণ পুরোহিত ছাড়াই বিয়ের অনুষ্ঠান করা, 'মনুস্মৃতি' পোড়ানো, পুরোপুরি নিরীশ্বরবাদ মেনে চলা ইত্যাদি।

তামিলনাড়ুতে পেরিয়ারের নেতৃত্বে এই আত্মসম্মান বা আত্মমর্যাদার আন্দোলন ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের আধিপত্য থেকে নিম্নবর্গের মানুষদের মুক্ত করতে চেষ্টা করেছে। মনুবাদী নিয়ম কানুনের বিরুদ্ধাচরণ করেছে। পিছিয়ে পড়া শ্রেণির মানুষের মন থেকে হীনমন্যতা সরিয়ে আত্মবিশ্বাস তৈরি করতে এই আন্দোলন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। এই আন্দোলন মানুষের মনে এমন একটা সমাজের ধারণা উপস্থাপিত করেছিল যেখানে জাতিভেদ, অস্পৃশ্যতা বা লিঙ্গবৈষম্য থাকবে না।

পেরিয়ার ঘোষণা করেছিলেন, আত্মসম্মান আন্দোলনই প্রকৃত অর্থে স্বাধীনতা আন্দোলন। তাঁর মতে, ব্যক্তির আত্মমর্যাদা বোধ ছাড়া দেশের রাজনৈতিক স্বাধীনতা কখনোই ফলপ্রসূ হতে পারে না।

১৯২৯ সালে প্রথম আত্মমর্যাদা সম্মেলনে পেরিয়ার এই আন্দোলনের নীতি ও প্রাসঙ্গিকতা ব্যাখ্যা করেন। এই আন্দোলনের প্রধান নীতিগুলি (Principles) হলো—মানুষে মানুষে কোনো ধরনের অসাম্য করা যাবে না, ধনী দরিদ্রের পার্থক্য করা যাবে না, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে পুরুষ ও নারীর সমানাধিকার থাকবে, জাত-ধর্ম-বর্ণভেদ সমাজ থেকে বিলুপ্ত করতে হবে। প্রত্যেকটি মানুষকে যে কোনো ধরনের দাসত্ব থেকে মুক্ত করতে হবে যাতে সে যুক্তি বোধ এবং আত্মসম্মানের সঙ্গে জীবন ধারণ করতে পারে।

দলিত আন্দোলন এবং আম্বেদকর
(Dalit Movement and Ambedkar)

ড. ভীমরাও আম্বেদকর তাঁর নিজের জীবনের অভিজ্ঞতায় বুঝেছিলেন যে দলিত-মুক্তির জন্য শিক্ষা এবং সচেতনতা অবশ্যই প্রয়োজন কিন্তু তার সাথে প্রয়োজন এই অধীত চেতনা রূপায়ণের লক্ষ্যে উপযুক্ত সংগঠন। দলিত মানুষের মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা করাই ছিল আম্বেদকরের মূল লক্ষ্য। তাঁর লড়াই ছিল ভারতীয় জাত-ভিত্তিক বদ্ধ সমাজে যুগ যুগ ধরে চলে আসা অন্যায় সামাজিক প্রথার বিরুদ্ধে। তিনি মনে করতেন, দেশের সামগ্রিক উন্নতির স্বার্থেই দলিতদের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক মর্যাদা দেওয়া জরুরী। বঞ্চিত দলিত সমাজের স্বতন্ত্র সত্তা নির্মাণের লক্ষ্যে তিনি সংঘবদ্ধ কর্মপ্রচেষ্টা গ্রহণের পক্ষপাতী ছিলেন। এই কারণে তাঁর নেতৃত্বে ১৯২৪ সালে 'ডিপ্রেসড্ ক্লাসেস

ওয়েলফেয়ার এ্যাসোসিয়েশন' গঠিত হয়। অস্পৃশ্য জাতভুক্ত মানুষের আর্থনৈতিক উন্নতি, শিক্ষা-সচেতনতার প্রসার এবং যুক্তিবাদী সামাজিক পরিবেশ তৈরি করাই ছিল সংগঠনের মুখ্য উদ্দেশ্য। এই সংগঠন ১৯২৭ সালের মাঝামাঝি এক পরিষদ গঠন করে। দলিতদের স্থানীয় দাবিগুলির পূর্ণ রূপায়ণের লক্ষ্যে এই পরিষদ কর্মসূচি গ্রহণ করে। হাজার হাজার দলিত মানুষের উপস্থিতিতে এক জনসভা সংঘটিত হয়। এই সভায় ড. আম্বেদকর দলিত মানুষদের কুসংস্কার থেকে নিজেদের মুক্ত করে যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলার পরামর্শ দেন। তাঁর মতে, এই হতাশ অবস্থা থেকে মুক্তির প্রথম শর্ত হলো নিজেদের মর্যাদাবোধ এবং আত্মবিশ্বাস। এই পরিষদের সিদ্ধান্ত মতো 'মনুস্মৃতি' গ্রন্থটি প্রকাশ্যে পোড়ানো হয় কারণ মনু অস্পৃশ্যতা সমর্থন করে শূদ্রজাতির নিন্দা করেছিলেন। এইভাবে দলিত সমাজের সামাজিক পরাধীনতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষিত হলো। অস্পৃশ্য করে রাখা মানুষদের আন্দোলনের মধ্য দিয়েই কোলাবার প্রসিদ্ধ চৌদুয়ার জলাশয় তারা ব্যবহার করার অধিকার অর্জন করল। ১৯২৮ সালে হিন্দু মন্দিরে তথাকথিত অস্পৃশ্য মানুষদের প্রবেশাধিকার স্বীকৃতি লাভ করল। এখানকার দলিত নেতারা প্রথমে তাদের আলাদা একটি মন্দির নির্মাণের পরিকল্পনা করেন। ড. আম্বেদকর তাদের বোঝান দলিত মানুষের জন্য আলাদা মন্দির নির্মাণ করলে এই সামাজিক বৈষম্যকেই আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দেওয়া হবে। তাছাড়াও আম্বেদকরের কাছে মূর্তিপুজোর চেয়ে মানব সেবাই অনেক বেশি গুরুত্ব পেত। ১৯২০ সালের জানুয়ারি মাসে ড. আম্বেদকরের সম্পাদনায় প্রকাশিত মারাঠী ভাষার সাপ্তাহিক পত্রিকা 'মুকনায়ক' এবং ১৯২৭ সালের এপ্রিল মাসে মারাঠী পাক্ষিক পত্রিকা 'বহিষ্কৃত ভারত' প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকা দুটিতে দলিতদের সমানাধিকারের দাবিতে যুক্তিপূর্ণ রচনা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে থাকে। সমানাধিকারের দাবিতে দলিত সমাজের আন্দোলনের সপক্ষে বৌদ্ধিক প্রেক্ষাপট গড়ে তোলার ক্ষেত্রেও এই পত্রিকাদ্বয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। দলিত সমাজের আত্মমর্যাদা ও সমানাধিকারের আন্দোলনের পরিসর আরও বৃদ্ধি করতে তিনি ১৯২৮ সালে বোম্বাইতে 'ডিপ্রেসড্ ক্লাসেস এডুকেশন সোসাইটি' গঠন করেন এবং 'সমতা' নামে আরও একটি পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশনার কাজ শুরু করেন।

অধ্যাপক অমর্ত্য সেন ও অধ্যাপক জঁ দ্রেজ-এর মতে, ড. বি. আর. আম্বেদকর আমাদের মনে করিয়ে দিয়েছেন যে সংগঠন, আন্দোলন, বিক্ষোভকে সবল ও তথ্যনিষ্ঠ যুক্তিভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন। আম্বেদকরের আহ্বান ছিল—'শিক্ষিত করো, বিক্ষুব্ধ করো এবং সংগঠিত করো।' এখানে তাঁর প্রথম শব্দটি খুবই মূল্যবান : 'শিক্ষিত করো'—যার ভিত্তি হবে সঠিক তথ্য এবং যুক্তি নির্ভরতা।

ড. বি. আর. আম্বেদকর ভারতীয় সমাজে চতুর্বর্ণাশ্রম ও জাতব্যবস্থার উদ্ভব ও

বিকাশ সম্পর্কে সুগভীর অধ্যয়ন করেছিলেন। বর্ণ ও জাতভিত্তিক সমাজের বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা তাঁর 'The Annihilation of Caste' (1936) প্রবন্ধটিতে পাওয়া যায়। তাঁর অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধিতে ছিল যে ভারতে জাতবর্ণভিত্তিক সমাজকাঠামোই মূলত সমাজ প্রগতির পথে বড় অন্তরায়। সেটা কেবল এই কারণে নয় যে, এই ব্যবস্থার ফলে স্বাভাবিক শ্রমবিভাজন ঘটতে পারেনি এবং অর্থনৈতিক দক্ষতাও গড়ে উঠতে পারেনি। এর চেয়েও গভীর সমস্যা হলো যে এর ফলে এক অতীব ক্ষতিকর সামাজিক বিভাজন তৈরি হয়েছে, সমাজের মানুষ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ও স্বতন্ত্র খোপে খোপে আবদ্ধ থেকে গেছে। বি. আর. আম্বেদকরের মন্তব্য এক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য। তাঁর মতে, জাতপাতের প্রথাটি কেবল শ্রমের বিভাজন নয়, শ্রমিকের বিভাজনও বটে। তিনি আরও বলেন, 'জাতিবর্ণভিত্তিক ব্যবস্থা কেবল শ্রমবিভাজন থেকে ভিন্ন গোত্রের শ্রমিক বিভাজনের একটি ব্যবস্থাই নয়, এটা এমন এক উচ্চাবচ কাঠামো, যেখানে এক স্তরের শ্রমিকের অবস্থান আর এক স্তরের নীচে।' জাত বর্ণভিত্তিক উচ্চবচতার ভিত্তিতে ভারতীয় সমাজের এই 'স্তরবিন্যস্ত অসাম্য' শ্রমিকদের মধ্যে বিভাজনকে আরও জটিল করে তুলছে। এর ফলে এই ক্ষতিকর অবস্থার পরিবর্তনের কাজটা আরও কঠিন হয়ে যায়। উপরিউক্ত গ্রন্থটিতে ড. আম্বেদকর তাঁর যুক্তিবাদী প্রত্যয়যুক্ত লেখনীতে হিন্দুসমাজে জাতব্যবস্থা বিলুপ্তির পন্থা প্রকরণ সুপারিশ করেছিলেন। তাঁর মত, অন্তর্বিবাহ-ব্যবস্থার মাধ্যমেই জাতব্যবস্থা প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে সুরক্ষিত থাকে। সেই কারণে অসবর্ণ বিবাহের ব্যাপক প্রচলন জাতব্যবস্থা বিলুপ্তির অন্যতম প্রাক্-শর্ত। কারণ, বিভিন্ন জাতভুক্ত মানুষের বৈবাহিক সম্পর্কের ভিত্তিতে জাত নব প্রজন্মের অস্তিত্ব ও বৃদ্ধির মাধ্যমেই এই জাতব্যবস্থা বিলুপ্ত হবার সম্ভাবনা তৈরি হতে পারে।

আম্বেদকরের মতে, জাত-বর্ণ-প্রথা ভারতীয় সমাজে যুগ যুগ ধরে তার অস্তিত্ব বজায় রেখেছে শাস্ত্রের সমর্থনে আর মানুষের বিশ্বাসে। ধর্মবিশ্বাসী মানুষ মনে করে জাতপ্রথা এবং এই সংক্রান্ত রীতি-নীতি যেহেতু শাস্ত্রসম্মত তাই এসব সত্য অবশ্য পালনীয়। বেদই ভারতীয় সমাজে বর্ণ ব্যবস্থার ভিত্তি। ব্রাহ্মণ্যবাদী হিন্দু ধর্মমত কখনোই প্রশ্নের মুখোমুখি হয়নি। ব্রাহ্মণ্যবাদী হিন্দু ভাবাদর্শের মধ্যেই জাতবর্ণের শিকড় গভীরভাবে প্রোথিত হয়েছে। তাই শাস্ত্র সম্পর্কিত পবিত্রতাবোধ আর তার প্রতি পূর্ণ আনুগত্যের মানসিকতার পরিবর্তন না হলে জাতভিত্তিক বদ্ধ সমাজ থেকে মুক্ত হওয়া সম্ভব নয়। তাঁর প্রশ্ন কেন ভারতীয় হিন্দু সমাজে নিম্নবর্ণের সঙ্গে খাদ্যগ্রহণ এবং বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনে আপত্তি রয়েছে, তথ্য অনুসন্ধানের পর তিনি বলেন যেহেতু এই ধর্ম অনুসারে 'নীচু' জাতের সাথে ভোজন করা বা বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার মতো কাজকে সম্পূর্ণরূপে অপবিত্র কাজ বলে গণ্য করা হয়।

আম্বেদকরের মতে হিন্দুধর্ম জাত-বর্ণভিত্তিক 'স্তরবিন্যস্ত অসাম্যকে' স্বীকৃতি দেয়।

মনুসংহিতায় জাতভিত্তিক ক্রমোচ্চ স্তরবিন্যাসকে মান্যতা দেওয়া হয়েছে। হিন্দু সমাজে স্তরবিন্যাস অনুসারে সর্বোচ্চ স্তরে আসীন ব্রাহ্মণ তারপর ক্রমশ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র। হিন্দু সমাজে ব্রাহ্মণদের স্বীকৃতি ও প্রাধান্য সবচেয়ে বেশি ছিল। এই গুরুত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় ধর্মীয় শাস্ত্রের সহায়তায়। জাতবর্ণভিত্তিক রীতি নীতির কঠোরতা ব্রাহ্মণদের মধ্যেই সবচেয়ে বেশি। বিশেষ করে অন্য জাতের খাদ্যগ্রহণ ও বিবাহসম্পর্কের ক্ষেত্রে। স্তরবিন্যস্ত হিন্দু সমাজে জাতবর্ণের অবস্থান অনুযায়ী নিয়মকানুন পালন করার কঠোরতা ধীরে ধীরে হ্রাস পেতে থাকে। ব্রাহ্মণদের মতো ক্ষত্রিয়দের ক্ষেত্রেও অন্তর্জাতি বিবাহ, খাদ্য গ্রহণের বিধিনিষেধ, বৈধব্য, বাল্যবিবাহ ইত্যাদি নিয়ম কানুন কঠোরতার সঙ্গে পালন করা হয়। কিন্তু এর নীচের জাতবর্ণগুলির মধ্যে নিয়মকানুন পালনের এতটা কঠোরতা লক্ষ করা যায় না। প্রকৃত পক্ষে উচ্চবর্ণের জাতগোষ্ঠীগুলি প্রবলভাবে আত্মসচেতন। তারা নিজেদের জাত পরিচয়ে আবদ্ধ থেকে তুলনায় নীচু জাতের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে কঠোর বিধিনিষেধ আরোপ করেছে যাতে তাদের প্রতিষ্ঠা এবং সম্মানবোধের জায়গা কোনোভাবেই বিপন্ন না হয়। আম্বেদকরের মতে, উচ্চ জাতবর্ণের মাহাত্ম্য প্রকাশ করতে গিয়ে নীচু জাতগুলির 'ক্ষুদ্রত্বকে' সচেতনভাবে প্রকট করা হয়েছে।

ড. বি. আর. আম্বেদকর সমাজবিজ্ঞানীর দৃষ্টিভঙ্গিতে ভারতীয় সমাজে অস্পৃশ্যতার সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেন। এই বিষয়ে তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনাগুলি হল—১৯৪৩ সালে প্রকাশিত 'হুইচ ইজ ওয়ার্স?' স্লেভারি অর আনটাচেবিলিটি', ১৯৪৬-এ লেখা 'হু ওয়্যার দ্য শূদ্রস?' ১৯৪৮-এ প্রকাশিত তাঁর এ সম্পর্কিত বিশিষ্ট গ্রন্থ 'দা আনটাচেবলস : হু ওয়্যার দে অ্যান্ড হোয়াই দে বিকেম আনটাচেবলস? এছাড়াও 'অন আনটাচেবলস', 'অ্যান এন্টি-আনটাচেবিলিটি অ্যাজেন্ডা' প্রভৃতি এই বিষয়ে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ রচনা। আম্বেদকরের মতে, একটি ভয়াবহ সমস্যা হিসেবে অস্পৃশ্যতার সঙ্গে জড়িয়ে আছে হিন্দুধর্মের অনুশাসন। তাই তিনি অস্পৃশ্যতা বিরোধী আন্দোলন সংগঠিত করার সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু চতুর্বর্ণ প্রথার বিরুদ্ধেও সচেতনতা বৃদ্ধির আন্দোলন শুরু করেন। তাঁর মতে, হিন্দু সমাজে প্রচলিত এই প্রথা অসাম্যের প্রতীক। তিনি মনে করতেন জাতব্যবস্থার অবলুপ্তি না হলে ভারতীয় সমাজ থেকে অস্পৃশ্যতা দূর করা যাবে না।

১৯৩১ সালের ১৪ই আগস্ট গান্ধীজীর সঙ্গে ড. আম্বেদকরের ভারতীয় হিন্দু সমাজের অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ বিষয়ে এক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হয়। এর প্রেক্ষাপট ছিল ভারতের ভবিষ্যৎ শাসনবিধি নির্ধারণের উদ্দেশ্যে হাউস অব লর্ডসে ১৯৩০ সালের ১২ই নভেম্বর আহূত গোল টেবিল বৈঠক। এই বৈঠকে ড. আম্বেদকর বলেন, তিনি ভারতের মোট জনসংখ্যার এক পঞ্চমাংশ নির্যাতিত মানুষের প্রতিনিধি। ব্রিটিশ রাজত্বে এক বিরাট

সংখ্যাক নির্যাতিত মানুষ ক্রীতদাস অপেক্ষাও ঘৃণ্য অবস্থায় জীবন যাপন করে। জলাশয়, মন্দির, শিক্ষা নিকেতন প্রভৃতিতে অস্পৃশ্য জাতভুক্ত মানুষের প্রবেশাধিকার নেই। সরকারী চাকুরী, পুলিশ ও সেনা বিভাগে নিম্নবর্ণের মানুষ সমান অধিকার পায় না। এরা ন্যূনতম মজুরী পায় না। জমিদার, মহাজনদের শোষণ এঁদের নিঃস্ব করে দিয়েছে। দারিদ্র্য ও নিরক্ষরতার কারণে নানা কুসংস্কার এদের চিন্তা-চেতনাকে গ্রাস করেছে। প্রতিদিন এঁদের উচ্চবর্ণের নিপীড়ন সহ্য করেই বাঁচতে হয়।

গান্ধীজীর সাথে ১৯৩১ সালের আলোচনাতেও ড. আম্বেদকরের বক্তব্য ছিল অভিমান-অভিযোগে ভরা। তাঁর অভিযোগ ইংরেজদের প্রভুত্বমূলক আচরণ তো আছেই, বর্ণ হিন্দুরাও দলিত মানুষের সাথে অমর্যাদা ও নিপীড়নমূলক আচরণ করে। গোলটেবিল বৈঠকে তাঁর বক্তব্যের সুরেই গান্ধীজীর কাছে ড. আম্বেদকর অস্পৃশ্যদের জন্য স্বতন্ত্র রাজনৈতিক অধিকারের প্রয়োজনের বিষয়টি উত্থাপন করেন।

জার্মানির বন বিশ্ববিদ্যালয়ের ইণ্ডোলজির বিখ্যাত অধ্যাপক জেকবির সান্নিধ্য আম্বেদকরের জীবনে আর একটি আলোকবর্তিকার মতো। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরাট গ্রন্থাগারের একটি বিশেষ বিভাগে আছে ভারতীয় প্রাচীন সাহিত্যের প্রচুর সংগ্রহ। অধ্যাপক জেকবির সাথে আলোচনা আর গ্রন্থাগারে অমূল্য সব গ্রন্থ পাঠের মধ্য দিয়ে আম্বেদকর প্রাচীন ভারতের সমাজে বর্ণপ্রথা, জাতব্যবস্থা, অস্পৃশ্যতার উদ্ভব ইত্যাদি বিষয়ে বহু তথ্য সংগ্রহ করতে থাকেন। ম্যাক্সমূলারের করা 'মনুস্মৃতি'র ইংরেজী অনুবাদ ভীমরাও আগে পড়েছিলেন। সেই সময়ই এই বই আম্বেদকরের চিন্তা-চেতনায় আলোড়ন তুলেছিল। অধ্যাপক জেকবির পরামর্শে আবার স্যার উইলিয়ম জোন্সের অনুবাদ করা 'মনুসংহিতা' পড়েন। আম্বেদকরের মনে হলো এই গ্রন্থের অধিকাংশ শ্লোকই যেন এক একটি অদৃশ্য শেকল, হিন্দু সমাজে জাত বহির্ভূতদের অস্পৃশ্য করে রাখার ক্ষেত্রে যা কঠোরভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। নারীদের সম্পর্কেও রয়েছে সব চরম অপমানজনক উক্তি। তাঁর মতে, মনুস্মৃতি ভারতীয় সমাজে উঁচু জাতগোষ্ঠী কর্তৃক নীচু জাত ও অস্পৃশ্যদের উপর শোষণ ও নির্যাতনের এক অমানবিক ব্রাহ্মণ্যবাদী দলিল। তাই আম্বেদকরের কাছে ভারতবর্ষে অস্পৃশ্যতাবিরোধী আন্দোলন একই সাথে সমাজের মানুষের মনুবাদী চিন্তা-চেতনার বিরুদ্ধে আন্দোলন। তিনি মনে করতেন, মনুবাদী এবং ব্রাহ্মণ্যবাদী চিন্তা-চেতনার আধিপত্যে এমন সমাজ গড়ে তোলা খুব কঠিন যেখানে অস্পৃশ্য-দলিতরা বঞ্চনা ও নিপীড়ন থেকে মুক্ত হবে। তাঁর মতে, একটি সাম্য-ভিত্তিক সমাজ গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজন দলিত সমাজের আত্মবিশ্বাস এবং আত্ম জাগরণ। তিনি চেয়েছিলেন নিজেদের স্বার্থের কারণেই তারা সচেতন ও সংগঠিত হবে। এই

উদ্দেশ্যে আম্বেদকর অস্পৃশ্য-দলিত জাতিকে পাঁচটি নির্দিষ্ট নীতি অনুসরণ করার ক্ষেত্রে যুক্ত করেছেন। এই নীতিসমূহ এক সাথে 'পঞ্চসূত্র (Five Principles) নামে পরিচিত। এগুলি হল—আত্মউন্নতি, আত্মপ্রগতি, আত্মনির্ভরতা, আত্মসম্মান এবং আত্মবিশ্বাস।

আম্বেদকর মনে করতেন, জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে দলিত সমাজের মানুষদের দৈনন্দিন জীবনচর্যায় পরিবর্তন আনতে হবে। আচরণ, সামাজিক অভ্যাস, পেশা বা বৃত্তি ইত্যাদিতে পরিবর্তন প্রয়োজন। মাদকাসক্তি এবং পচা খাদ্য ভক্ষণ পরিহার করতে হবে। এসব ক্ষেত্রে ড. আম্বেদকর দলিত সমাজের শিশুদের শিক্ষা, সচেতনতা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, সুরুচি ইত্যাদি বিষয়গুলির উপর সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাঁর মতে, দলিত-অস্পৃশ্য জাতির উপর উঁচু জাতের নির্যাতন নিপীড়নের বিরুদ্ধে দলিত জাতির জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে দলিত সমাজের নিরবচ্ছিন্ন কর্মপ্রচেষ্টার ভিত্তি হবে আরও তিনটি নীতি (Three Principles)। এগুলি হল—শিক্ষা, বিক্ষোভ ও সংগঠন (Education, Agitation and Organisation)। ড. আম্বেদকরের মতে প্রথমত, উচ্চবর্ণের মানুষের কাছে দলিত সমাজের মানুষের মর্যাদা আদায় করার প্রাথমিক শর্ত শিক্ষিত হওয়া। দ্বিতীয়ত, নিজেদের 'দলিত' অবস্থার 'ধর্মীয়' ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট না থেকে এই নিপীড়িত অবস্থার জন্য 'উঁচু জাতের' যারা দায়ী তাঁদের বিরুদ্ধে অসন্তোষ তৈরি করতে হবে। তৃতীয়ত, এসবের উপর নির্ভর করে তৈরি করতে হবে দলিত শ্রেণির মানুষদের পরিচিত-সত্তার ভিত্তিতে এক নিজস্ব সংগঠন। ড. আম্বেদকর মনে করেন দলিত সমাজের সামগ্রিক লক্ষ্যপূরণে সংগঠিত আন্দোলন অপরিহার্য।

ড. বি. আর. আম্বেদকরের সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার আন্দোলন বৃহত্তর পরিসরে ব্রাহ্মণ্যবাদী ব্যবস্থায় নারী অবদমনকেও ছুঁয়ে গিয়েছিল। ভারতীয় সমাজে অবদমিত মানুষের মধ্যে এক বৃহৎ অংশ নারী। তাই তাঁর সামাজিক ন্যায় সম্পর্কিত ভাবনার অনেকটাই জুড়ে ছিল জাত-বর্ণ নির্বিশেষে ভারতীয় সমাজে নারীর অবদমন। ব্রাহ্মণ্যবাদী ব্যবস্থার সঠিক সমালোচনা করতে গিয়ে তাঁর কথায়-লেখায় বার বার উঠে এসেছে পিতৃতন্ত্রের বিরোধিতা। দলিত সমাজের অভ্যন্তরেও পিতৃতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অনলস ছিলেন ড. আম্বেদকর। জাত-পাত, অস্পৃশ্যতা ও নারী অবদমনের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নারীদের অংশগ্রহণ করার বিষয়টাও তাঁর কাছে ছিল সমান গুরুত্বপূর্ণ। পুণে বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজতত্ত্ব ও মানবী বিদ্যাচর্চার অধ্যাপিকা শর্মিলা রেগের লেখায় এর বিশদ পরিচয় পাওয়া যায়। ১৯২৭ সালের মাহার সত্যাগ্রহের সময় থেকেই ড. আম্বেদকর নারীদের উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে তাঁদের জন্য পৃথক সভার আয়োজন করতেন। এই ধরনের সভাগুলিতে যুক্তি নির্ভর আবেগমথিত কণ্ঠে তাঁর মূল বক্তব্য ছিল জ্ঞান ও শিক্ষা পুরুষের অধিকার হতে পারে না। নারীর জন্যও তা সমানভাবে আবশ্যক। দলিত

মানুষদের উপর উচ্চবর্ণের মানুষদের নিপীড়নের সমস্যাটা পুরুষ ও নারী উভয়কেই যৌথ ভাবে মোকাবিলা করতে হবে। সেই কারণে এই সভাগুলিতে মহিলাদের সমানভাবে উপস্থিত থাকা খুব প্রয়োজন। এই ধরনের সভাগুলি থেকে একদল মহিলা নেত্রী ও সংগঠক গড়ে ওঠেন। এর ফলে মাহারে এক ধরণের মহিলা মণ্ডল আন্দোলনেরও সূচনা হয়। ১৯৪৮ সালে বোম্বাইয়ের সিদ্ধার্থ কলেজে একটি সভায় মহিলারা ড. বাবাসাহেব আম্বেদকরের ত্রি-নীতিতে উদ্বুদ্ধ হয়ে পৃথকভাবে দলিত মহিলা সংগঠনের মাধ্যমে 'শিক্ষিত কর, বিক্ষুব্ধ কর এবং সংগঠিত কর' প্রচারের আবশ্যকতা তুলে ধরেন।

ব্যাপক অর্থে ড. বি. আর. আম্বেদকরের ধর্ম সম্পর্কিত চিন্তাভাবনা ও প্রয়োগ তাঁর সমাজচিন্তারই অংশ। তাঁর মতে, হিন্দু ধর্মের বিশ্লেষণ ব্যতিরেকে ভারতীয় সমাজে জাতব্যবস্থা ও অস্পৃশ্যতার বিষয়গুলি বোঝা সম্ভব নয়। তিনি তাঁর জীবন অভিজ্ঞতায় উপলব্ধি করেছেন কীভাবে হিন্দুধর্ম দলিত অস্পৃশ্য মানুষদের মানবজীবনের ন্যূনতম অধিকারগুলি থেকেও বঞ্চিত রেখেছে। তাঁর কাছে এসবই হচ্ছে ধর্মের নেতিবাচক দিক।

অস্পৃশ্য জাতভুক্ত মাহার পরিবারে জন্মসূত্রে খুব ছোটবেলা থেকেই আম্বেদকর ধর্মীয় নিপীড়ন হিন্দুধর্মকে কতটা কলুষিত করেছে তা প্রত্যক্ষ করেছেন। হিন্দু ধর্ম কখনোই সাম্যের আদর্শকে স্বীকৃতি জানায়নি। হিন্দুধর্মের ভিত্তি যে বর্ণ ব্যবস্থা তা স্পষ্টতই মানুষে মানুষে বৈষম্যকে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। এই ব্যবস্থা আরোপিত। জন্মসূত্রেই জাতকের সামাজিক মর্যাদা নির্ধারিত হয়। 'উঁচু জাতে'র ঘরে সন্তান আজীবন আরোপিত সামাজিক মর্যাদার অধিকারী। তথাকথিত 'নীচু জাতে' জন্ম গ্রহণ করা মানুষ শিক্ষিত হলেও একই রকম সামাজিক মর্যাদা লাভ করতে পারে না। বর্ণবৈষম্যের অভিশাপে অভিশপ্ত ছিল আম্বেদকরের নিজের জীবন। আম্বেদকর মনে করতেন, জাতবর্ণ প্রথা অস্তিত্ব বজায় রেখেছে শাস্ত্রের সমর্থনে আর মানুষের অন্ধ বিশ্বাসকে ভিত্তি করে। এই অন্ধ বিশ্বাসই হিন্দু ধর্মগ্রন্থগুলিকে প্রশ্নহীন করে তুলেছে। বিভিন্ন হিন্দু ধর্মগ্রন্থ পাঠ করে এবং পাশাপাশি নিজের জীবনের অভিজ্ঞতায় আম্বেদকর হিন্দু ধর্মের সীমাবদ্ধতা এবং নেতিবাচক দিকগুলি সম্পর্কে অবগত ছিলেন। তিনি মনে করতেন, প্রকৃত ধর্ম হিসাবে গড়ে উঠতে হলে এই ধর্মকে অভ্যন্তরীণভাবে আরও উদার হতে হবে। এই উদার চেতনায় অস্পৃশ্যতা দূরীভূত হবে। প্রকৃত ধর্মের বৈশিষ্ট্য হিসাবে সাম্যের আদর্শ হিন্দু সমাজেও প্রবর্তিত হবে। এই লক্ষ্য পূরণে সবার আগে দরকার বর্ণব্যবস্থা নির্মূল করা কারণ এই বর্ণব্যবস্থাই অস্পৃশ্যতার জননী। হিন্দু ধর্মকে প্রকৃত ধর্মে পর্যবসিত করার জন্য আম্বেদকার এই ধর্মের সংস্কারে সচেষ্ট হন। হিন্দু ধর্মাবলম্বী বিশিষ্ট পণ্ডিতদের তিনি বারবার অনুরোধ করেছিলেন প্রকৃত ধর্ম হয়ে ওঠার প্রতিবন্ধক হিন্দুধর্মের চিহ্নিত ত্রুটিগুলি সংশোধনের

জন্য, সাম্যবোধের আদর্শে এই ধর্মকে ক্রিয়াশীল করে তোলবার জন্য। ড. আম্বেদকর বিশ্বাস করতেন সাম্যের ভিত্তিতে, সব মানুষের আত্মমর্যাদার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা হিন্দুধর্ম অনেক বেশি শক্তিশালী রূপ পরিগ্রহ করবে।

হিন্দুধর্মের এই বিভেদ বৈষম্য সম্পর্কে দলিত মানুষদের শিক্ষিত, সচেতন ও সংগঠিত করার কাজটাও অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ বলে আম্বেদকর মনে করতেন। জাতব্যবস্থা আর অস্পৃশ্যতা যুগ যুগ ধরে অস্তিত্ব বজায় রেখেছে শাস্ত্রের সমর্থনে আর মানুষের অসচেতন বিশ্বাসে। তিনি বুঝতে পারলেন হিন্দু মন্দিরগুলিতে দলিত মানুষের প্রবেশের আন্দোলন শুরু করতে হবে। তাঁর কাছে, মন্দিরে দলিত মানুষদের প্রবেশের ঘটনা যথেষ্ট অর্থবহ ও প্রতীকি।

হিন্দুধর্মীয় কাঠামোয় অভ্যন্তরীণভাবে সাম্যের আদর্শ প্রবিষ্ট করানোর কাজটা যে খুবই কঠিন এটা আম্বেদকর অচিরেই বুঝতে পারলেন। হিন্দুধর্মের প্রতি তাঁর হতাশা ধীরে ধীরে প্রকট হতে শুরু করল। তাঁর মনে হল, হিন্দু ধর্মের দেয়ালে মাথা ঠোকাই সার হবে। এর ফলে মাথা চৌচির হয়ে গেলেও 'সাম্য, স্বাধীনতা ও সৌভ্রাতৃত্বের বিরোধিতার' পথ থেকে হিন্দু ধর্মকে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হবে না। ১৯৩৫ সালের অক্টোবর মাসে নাসিকে এক বৃহৎ দলিত সম্মেলনে তিনি হিন্দুধর্মের সমালোচনায় মুখর হয়ে ওঠেন। তাঁর কথায়, মানবতার ন্যূনতম অধিকারবোধ থেকে দলিত সমাজ সাম্যের ভিত্তিতে হিন্দুধর্মে প্রবেশাধিকার চেয়েছিল। এতদিনের সক্রিয় দলিত আন্দোলনেও তার কোনো সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে এমন কথা বলা যায় না। ঐ সম্মেলনেই বাবাসাহেব আম্বেদকর ধর্ম পরিবর্তনের দিকে ইঙ্গিত দেন। সমান্তরাল ধর্মচিন্তার কথা তাঁর বক্তব্যে গুরুত্ব পায়। দলিত সমাজের প্রতি তাঁর আহ্বান— তথাকথিত হিন্দুধর্মের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করো, স্বাভিমান আর শান্তির লক্ষ্যে অন্যত্র যাও। কিন্তু মনে রাখবে, তোমার নির্বাচিত ধর্মে যেন সমান অধিকারবোধ, সম আচরণ এবং সাম্যবোধযুক্ত চেতনার স্পন্দন থাকে। বাবাসাহেব আম্বেদকরের হতাশা আর অভিমান ঝরে পড়ে তাঁর বক্তব্যের শেষ অংশে 'আমি অস্পৃশ্য জাতিতে জন্ম নিয়েছি, এতে কোনো অপরাধ ছিল না, কিন্তু মৃত্যুর সময় আমি হিন্দুরূপে থাকব না।'

বৌদ্ধ ধর্ম বাবাসাহেব আম্বেদকরের চিন্তাচেতনায় গভীরভাবে রেখাপাত করেছিল। তিনি গভীরভাবে বিশ্বাস করতে শুরু করলেন বৌদ্ধ ধর্মই পারে অস্পৃশ্য-দলিত ভারতবাসীকে মুক্ত করতে। এই ধর্মই এমন একটা ক্ষেত্র তৈরি করতে সক্ষম যেখানে দলিত মানুষ আত্মমর্যাদা ও সম্মান নিয়ে মাথা তুলে চলতে পারবে। বৌদ্ধ ধর্মের যুক্তিবাদী দর্শন এবং প্রশ্ন করার শিক্ষা আম্বেদকরকে ভীষণভাবে আকর্ষণ করেছিল।

ড. আম্বেদকরের কাছে, মানুষের জন্যই ধর্ম। ধর্মের শক্তি মানুষের নৈরাশ্য থেকে

মুক্তি ঘটায়। 'প্রকৃত ধর্ম' মানবজীবনে শক্তি ও আশার উৎসস্থল। বৌদ্ধ ধর্মের মধ্যে 'প্রকৃত ধর্মে'র অধিকাংশ বৈশিষ্ট্যগুলি খুঁজে পেয়েছিলেন ড. বাবাসাহেব আম্বেদকর। মানবিক আদর্শ, নৈতিকতা ও সাম্যভাবনা তিনি এই ধর্মের মধ্যে খুঁজে পেয়েছিলেন।

১৯৫৬ সালের ১৪ অক্টোবর ড. ভীমরাও আম্বেদকরের বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করার সেই মাহেন্দ্রক্ষণ। হাজার হাজার দলিত মানুষ ড. আম্বেদকরের অনুগামী হলেন। নাগপুরে তখন বিভিন্ন জায়গা থেকে আগত দলিত মানুষের ঢল। প্রথাগতভাবে মহাস্থবির চন্দ্রমণি ও চার বৌদ্ধ ভিক্ষু ড. আম্বেদকর ও তাঁর পত্নী সবিতা আম্বেদকরকে বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করান। তাঁর আগে ড. আম্বেদকর সমবেত দলিতদের উদ্দেশ্যে বলেন, তিনি বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করছেন। তবে প্রচলিত বৌদ্ধ ধর্ম থেকে তাঁর বৌদ্ধ ধর্ম স্মরণ হবে কিছুটা আলাদা। তার মধ্যে বৌদ্ধ ধর্মের সামান্য যে সীমাবদ্ধতাটুকু আছে তাও ত্যাগ করা হবে। এই বৌদ্ধ ধর্ম হবে 'নবযান' বা 'নব বৌদ্ধ ধর্ম'। তিনি দলিত সমাজের উদ্দেশ্যে বলেন, প্রত্যেককে বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করার সাথে সাথে হতে হবে বিচারশীল, পবিত্র, এবং আত্মমর্যাদাসম্পন্ন। এর জন্য প্রয়োজন ব্যক্তি ও সামাজিক অভ্যাসগুলির যথাযথ পরিবর্তন। এই সতর্কবাণী মাথায় রেখে হাজার হাজার আম্বেদকর অনুগামী দলিত সমাজের মানুষ বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেন।

সাম্প্রতিক দলিত রাজনীতি ও আন্দোলন
(Recent Dalit Politics and Movements)

ভারতবর্ষে 'দলিত' আন্দোলনগুলি পর্যালোচনা করলে প্রথম দিককার আন্দোলনগুলিকে মূলত সংস্কারমূলক আন্দোলন হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। এই সংস্কারমূলক আন্দোলনগুলির বিভিন্ন সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে দলিত আন্দোলন এবং আপেক্ষিক বঞ্চনা, 'সামাজিক সচলতা' ও 'নির্দেশক গোষ্ঠী' তত্ত্বের মধ্যে একটা যোগসূত্র খুঁজে পাওয়া যায় যা তাত্ত্বিক ও কৌশলগত দিক থেকে ভারতবর্ষের দলিত আন্দোলনের প্রকৃতি বুঝতে আমাদের সাহায্য করে। উদাহরণ হিসেবে ১৯৩০'এর দশকে মহারাষ্ট্রে 'সংস্কৃতায়ন (Sanskritization) প্রক্রিয়াকে অনুসরণ করে 'দলিত' আন্দোলনের কথা বলা যায় (ওমভেট, ১৯৯৪)।

আঁদ্রে বেতে মন্তব্য করেছেন, 'সাবেক সমাজবিন্যাসে যেসব জাতের স্থান বেশ নীচুতে তারাও খাদ্যাভ্যাস, সামাজিক রীতি, এমনকী দেব দেবীও উঁচু জাতের অনুকরণে বদলে ফেলতে শুরু করল। প্রতি দশকে আদমশুমারি বা জনগণনা হওয়ার সুবাদে অনেকে পুরনো উপাধি পাল্টে নতুন উপাধি নেবার সুযোগ পেল। সারা দেশে জাত সমিতি গড়ে উঠল এবং সেই সব সমিতি সামাজিক মর্যাদায় উঁচু স্থান দাবি করেই ক্ষান্ত

হলো না, উঁচু জাতের লোকেরা অবমাননাকর মনে করে এমন সব রীতি নীতি আচার পরিত্যাগ করার হুকুম দিল। কাজেই সংস্কৃতায়ন বিভিন্ন সামাজিক অংশের মধ্যে প্রচলিত শ্রেণীকরণের বেড়া ভেঙ্গে দিল (আঁদ্রে বেতে, ২০১৩)। সংস্কৃতায়ন প্রক্রিয়ার সঙ্গে সম্পর্কিত এই ধরনের আন্দোলনগুলির পাশাপাশি প্রথম দিককার দলিত আন্দোলনগুলি প্রকৃত পক্ষে অনেক ক্ষেত্রে হিন্দু ধর্মের বৃহত্তর পরিমণ্ডলে 'ভক্তি আন্দোলনের' রূপ পরিগ্রহ করে। আর এক ধরনের আন্দোলন আমরা পরবর্তী সময়ে ভারতবর্ষে দেখতে পাই যা ব্যাপক অর্থে দলিত আন্দোলনের অন্তর্ভুক্ত করা হয়, তা হলো 'ধর্মান্তর গ্রহণের প্রক্রিয়া (conversion)। মূলত হিন্দুসমাজে ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের আগ্রাসন থেকে মুক্তি লাভ করতে 'নীচু' জাতের অনেক মানুষ নির্যাতন ও অমানবিকতা থেকে মুক্তির আশায় ধর্মান্তরের মাধ্যমে ইসলাম, খ্রীষ্টান, বৌদ্ধ বা শিখ ধর্ম গ্রহণ করে। ড. আম্বেদকর নিজেও হিন্দুধর্ম পরিত্যাগ করে বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন।

প্রথম দিককার 'দলিত' আন্দোলনের চেহারা কার্যত এমন সংস্কারধর্মীই ছিল। জাস্টিস পার্টি আন্দোলন এবং পরে আরও সুস্পষ্টভাবে ড. আম্বেদকরের সময় থেকে এই আন্দোলন একটা রাজনৈতিক রূপ পরিগ্রহ করতে শুরু করে।

সাম্প্রতিককালে দলিত রাজনীতি ও আন্দোলন ভারতের বৌদ্ধিক ও ব্যবহারিক চর্চার বিষয় হিসেবে যথেষ্ট গুরুত্ব লাভ করেছে। দলিত সমাজের মুক্তি ও উন্নয়নে মহাত্মা গান্ধী ও আম্বেদকরের দৃষ্টিভঙ্গিগত ভিন্নতা ভারতের দলিত আন্দোলনকে যথেষ্ট মাত্রায় প্রভাবিত করে। সমাজ থেকে অস্পৃশ্যতা দূর করার বিষয়ে গান্ধীজী পথিকৃতের ভূমিকা পালন করেছিলেন। নিম্নতম বর্গের এই দলিত মানুষদের তিনি 'হরিজন' বলে সম্বোধন করতেন। তিনি হিন্দু বর্ণকাঠামোর মধ্যেই 'হরিজন'দের সামাজিকভাবে গ্রহণীয় করে তুলতে আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন। আম্বেদকর মহাত্মা গান্ধীর এই ধরনের প্রচেষ্টায় আস্থা রাখতে পারেন নি। তাঁর মতে, হিন্দু বর্ণাশ্রমী এই স্তরবিন্যাসের মধ্যে থেকে নিম্নবর্গের মানুষের জীবনে মুক্তির বাতাস নিয়ে আসা সম্ভব নয়। বর্ণভেদ-এর সঙ্গে যুক্ত পবিত্রতা-অপবিত্রতার ধারণা এই মুক্তির পথে প্রধান প্রতিবন্ধক। গান্ধীজীর নেতৃত্বে জাতীয় কংগ্রেস অস্পৃশ্যতা বিরোধী আন্দোলনকে জাতীয় আন্দোলনের অংশ করতে চেয়েছিল। ড. আম্বেদকর এই ইস্যুতে কংগ্রেস বিরোধী অবস্থান গ্রহণ করেন। তাঁরই চিন্তাধারা অনুসরণ করে ভারতবর্ষে 'দলিত-চেতনার' রাজনীতিকরণ ঘটেছে। এমন উপলব্ধি প্রবলতর হয়েছে যে বিশেষ দলিত চেতনা এবং দৃষ্টিভঙ্গি সমন্বিত রাজনৈতিক দল ছাড়া কার্যকরীভাবে দলিত-আন্দোলন গড়ে তোলা খুব কঠিন। এমনই একটা রাজনৈতিক দল হিসেবে রিপাবলিকান পার্টির মতো কোনো দল প্রতিষ্ঠা করার কথা তিনি ভেবেছিলেন। আম্বেদকর যদিও কোনো রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠা করে যেতে পারেন নি,

পরবর্তীকালে তাঁর ঘোষিত আদর্শের ভিত্তিতেই রিপাবলিকান পার্টি অব ইন্ডিয়া ১৯৫৭ সালে কাজ শুরু করেছিল। রিপাবলিকান দল দলিত-চেতনা বিকাশে ও আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিলেও তা বেশিদিন স্থায়িত্ব লাভ করতে পারেনি। এই পরিস্থিতিতে ১৯৭০-এর দশকে দলিত প্যান্থার দল দলিত প্রতিবাদের রাজনীতিতে এক নতুন মাত্রা নিয়ে আসে। গেল ওমভেটের মতে, ভারতবর্ষে আম্বেদকর-পরবর্তী দলিত আন্দোলনের ক্ষেত্রে দলিত প্যান্থারের আত্মপ্রকাশ একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইল ফলক (Gail Omvedt, 2002)। সারা ভারতবর্ষ জুড়ে 'দলিত রাজ' প্রতিষ্ঠার ঘোষিত লক্ষ্য নিয়ে মহারাষ্ট্রের রাজনীতিতে এই দলের উত্থান সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। দলিত প্যান্থারের আদর্শ অনুসরণ করে ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে 'দলিত' আন্দোলন ক্রমশ আত্মপ্রকাশ করতে থাকে। এই সময় বাম দল ও দলিত প্যান্থারের মধ্যে রাজনৈতিক সমঝোতা হয়। মহারাষ্ট্রে রিপাবলিকান পার্টির বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠীগুলি এক হয়ে এই সমঝোতাকে সমর্থন করেছিল। মাহাররাই দলিত প্যান্থারের সক্রিয় সদস্য ছিল।

শুধু সামাজিক প্রতিবন্ধকতা নয়, নিদারুণ অর্থনৈতিক বঞ্চনার ঘনিষ্ঠ যোগ রয়েছে দলিত মানুষদের প্রান্তিক অবস্থানে। কৃষি সম্পদ বিশেষ করে চাষের জমিতে দলিত মানুষের দখল নেই বললেই চলে। ভূমিহীনদের একটা বৃহৎ অংশ এরাই। শহরেও দরাদরির ক্ষমতাহীন অসংগঠিত শ্রেণির মজুরদের মধ্যেও এদের সংখ্যাই বেশি। গ্রাম-শহরে শোষণের মুখে এই দলিত মানুষেরা একেবারেই প্রতিরক্ষাহীন, তার সাথে যুক্ত হয়েছে দলিত জাতিভুক্ত হওয়ার জন্য প্রাত্যহিক নির্যাতন আর অপমান, বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে। উত্তর ভারতের বেশ কিছু রাজ্যে দলিত হবার কারণে নিয়মিত এই ধরনের অত্যাচারের মুখোমুখি হতে হয়। সাম্প্রতিককালের দলিত রাজনীতি ও আন্দোলন আবর্তিত হচ্ছে এই অর্থনৈতিক ও সামাজিক বঞ্চনাকে ভিত্তি করে।

বিংশ শতাব্দীর শেষের দিক থেকেই ভারতের রাজনীতিতে আঞ্চলিক দলগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে শুরু করে। দেশে তখন চরম অর্থনৈতিক সংকট। দলিত শ্রেণির প্রান্তিক মানুষের জীবন দুর্বিষহ। রাজনীতিতে জাতীয় কংগ্রেসের আধিপত্য হ্রাস পেতে থাকে। এই পরিপ্রেক্ষিতে ভারতবর্ষে দলিত-রাজনীতি ক্রমবর্ধমান গুরুত্ব লাভ করতে থাকে। অনেক সমাজবিজ্ঞানী ভারতে পরিচিতি-সত্তার রাজনীতি ও দলিত আন্দোলনের এই ধারাকে 'ভারতীয় রাজনীতির আংশিক দলিতায়ন' রূপেও আখ্যায়িত করেন। উদাহরণ হিসেবে বিহারে জগজীবন রাম ও পরবর্তী সময়ে মীরা কুমার কিংবা উত্তর প্রদেশে কাঁসিরাম বা বর্তমান সময়ে মায়াবতীর 'দলিত-রাজনীতি ও আন্দোলনের' কথা উল্লেখ করা যায়। ১৯৭৩ সালে কাঁসিরাম 'বহুজন অ্যান্ড মাইনরিটি কম্যুনিটি এমপ্লয়িজ ফেডারেশন' গঠন করেন। পরে ১৯৮৪ সালের ১৪ই এপ্রিল বাবা সাহেব

আম্বেদকরের জন্মদিবসে 'বহুজন সমাজ পার্টি' (BSP) প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৯০ এবং ২০০০-এর দশকে উত্তর ভারতে বহুজন সমাজ পার্টি যথেষ্ট শক্তিশালী হয়ে ওঠে। বহুজন সমাজ পার্টি মূলত দলিত মানুষদের সমর্থনের ভিত্তিতেই তাদের রাজনৈতিক আন্দোলন গড়ে তোলে।

হায়দ্রাবাদের 'সেন্টার ফর স্টাডি অব সোশ্যাল এক্সক্লুসন অ্যান্ড ইনক্লুসিভ পলিসির' অধিকর্তা কাঞ্চা ইলাইয়ার মত, ভারতবর্ষে সাম্প্রতিক কালে নতুন ধরনের দলিত আন্দোলন দেখা যাচ্ছে। ভারতবর্ষের দলিত মানুষদের স্বার্থে এটা খুবই ইতিবাচক লক্ষণ। বিশেষ করে যুব ও ছাত্র-সমাজ এই আন্দোলনগুলিতে সামিল হচ্ছে। উদাহরণ হিসেবে, ভীম আর্মির (Bhim Army) কথা বলা যায়। চন্দ্রশেখর আজাদের নেতৃত্বে ২০১৫ সালে এই দলিত সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়। লক্ষাধিক যুব-ছাত্র এর সক্রিয় সদস্য। মূলত দুটি এজেন্ডা সামনে রেখে এই সংগঠন কাজ করছে—১। দলিতদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার এবং ২। সর্বস্তরে দলিত মানুষের স্বার্থ রক্ষা। উত্তর প্রদেশে চন্দ্রশেখর আজাদ কিংবা গুজরাটে জিগ্নেস মেবানীর নেতৃত্বে দলিত ছাত্র-যুবদের নেতৃত্বে নানা আন্দোলন সংঘটিত হচ্ছে।

আমেরিকার নিউ ইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজতত্ত্বের অধ্যাপক বিবেক চিব্বার (Vivek Chibber) এ-প্রসঙ্গে তাঁর মতামত প্রকাশ করেছেন। তাঁর মতে, দলিত-ছাত্রদের চেতনার বিকাশ এবং আন্দোলনে যুক্ত হওয়া অবশ্যই যথেষ্ট ইতিবাচক বিষয়। তবে একথাও পাশাপাশি মনে রাখতে হবে যে খুব স্বল্প সংখ্যার দলিত মানুষ সংরক্ষণ ব্যবস্থার সুবিধা লাভ করেছে। তাই যদি সরকার নিয়োগ ক্ষেত্রে এবং শিক্ষা ক্ষেত্রে পুরো শক্তি দিয়েও সংরক্ষণ চালু করে তবুও তা খুব অল্প দলিত মানুষকে সুবিধা দিতে পারবে।

দলিত মানুষের প্রকৃত বিকাশের লক্ষ্যে দলিত আন্দোলনকে সমানাধিকার এবং সর্বজনীন স্বত্বাধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের সাথেও যুক্ত করতে হবে। অধ্যাপক অমর্ত্য সেনকে অনুসরণ করে বলা যায় এর জন্য শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টির উন্নয়নের মাধ্যমে এই সব মানুষের সামর্থ্য-বিকাশ (Capability) প্রয়োজন।

সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্ট (মার্চ ২০, ২০১৮) ১৯৮৯ সালে তৈরি দলিত নির্যাতন রোধের আইনের [SC/ST (Prevention of Atrocities Act)] কিছু ধারা খারিজ করে দেয়। এই ধারা অনুযায়ী তফসিলি জাতি-উপজাতির মানুষের উপর নির্যাতনে অভিযুক্তদের প্রাথমিক তদন্ত ছাড়াই গ্রেপ্তার করা যাবে। আগাম জামিনও মিলবে না। সুপ্রিম কোর্টের সাম্প্রতিক রায়ে বলা হয়, তফসিলি জাতি-উপজাতির মানুষের উপর নির্যাতনের অভিযোগ এলে পুলিশকে অভিযোগের সত্যতা যাচাই করার জন্য প্রাথমিক

তদন্ত করতে হবে। তদন্তে সাধারণভাবে অভিযোগ সত্য মনে হলেই অভিযুক্তের বিরুদ্ধে এফ. আই. আর. করা যাবে। প্রয়োজন মনে হলেই শুধুমাত্র অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা যাবে। মাননীয় বিচারপতি আদর্শ কুমার গয়াল-এর বেঞ্চ এই রায় দেন। পরে এই রায় পুনর্বিবেচনার দাবিও খারিজ করে দেয় সর্বোচ্চ আদালত।

দলিত নির্যাতন রোধের আইনকে লঘু করার বিরুদ্ধে সর্বভারতীয় আম্বেদকর মহাসভা (All India Ambedkar Mahasabha) বিক্ষোভ কর্মসূচি গ্রহণ করে। এগারো-বারোটি দলিত গোষ্ঠীর সমন্বয়কারী সংগঠন এই আম্বেদকর মহাসভা। দেশ জুড়ে বাড়তে থাকে দলিতদের ক্ষোভ। ২রা এপ্রিল, ২০১৮ এই রায়ের বিরুদ্ধে বনধ ডাকে দলিত সংগঠনগুলি। শতাধিক দলিত কর্মী গ্রেপ্তার হন। দলিত নেত্রী-নেতা বলে পরিচিত মায়াবতী, রামবিলাস পাসোয়ান, রামদাস আঠওয়াল-এর মতো ব্যক্তিরা এই রায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার হন। সরকার ও বিরোধী পক্ষের দলিত সাংসদরাও এর বিরুদ্ধে চাপ সৃষ্টি করতে থাকে। তফসিলি জাতি-উপজাতি নির্যাতন প্রতিরোধ আইনের যে সব ধারার ফাঁস আলগা করার রায় দিয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট, দলিত আন্দোলনের চাপে সেই সব ধারা ফের আইন পাস করে ফিরিয়ে আনার সিদ্ধান্ত নেয় কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা। (টেলিগ্রাফ ২রা আগস্ট, ২০২৮)

দলিত নির্যাতন রোধ সম্পর্কিত সুপ্রিম কোর্টের সাম্প্রতিক রায়, তাকে ভিত্তি করে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অংশে সংঘটিত দলিত আন্দোলন, দলিত সংগঠন ও রাজনৈতিক দলগুলির ভূমিকা এবং এর ফলাফল বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায়—চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী (Pressure Group) হিসেবে দলিত সংগঠন ও রাজনৈতিক দলগুলির ভূমিকা ভারতবর্ষে উত্তরোত্তর শক্তিশালী হচ্ছে।

সহায়ক গ্রন্থসূচী :

Shah, G. (2001) Dalit Identity and Politics, Sage Pub., New Delhi.

Gail Omvedt (1994) Dalits and the Democratic Revolution, Sage Pub., New Delhi.

Zelliot, E (1998) From Untouchable to Dalit : Essays on the Ambedkar Movement, Manohar, New Delhi.

Michael, SM ed. (2007), Dalit in Modern India : Vision and Values, Sage Pub., New Delhi.

Thorat, Sukhdeo (2009), Dalits in India : Search for a Common Destiny, Sage Pub. New Delhi.

Kumar Vivek (2010), "Different Shades of Dalit Mobilisation", in T. K. Oommen (ed.), Social Movements : Issues of Identity, OUP, New Delhi.

অনিরুদ্ধ চৌধুরী (২০১৮), ভারতের সমাজ প্রসঙ্গে, চ্যাটার্জি পাবলিসার্স, কলকাতা।